দ্বিখন্ডিত তসলিমা নাসরিন

প্রদীপ দেব

তসলিমা নাসরিনের নতুন লেখা চোখে পড়ছে না অনেকদিন। মাঝে মাঝে আনন্দবাজার পত্রিকার সিনেমা সমালোচনায় তসলিমা নাসরিনের লেখা দেখি - তবে তাও খুব অনিয়মিত। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক মৌলিক রচনা বলা চলে না। নিজের দেশের বাইরে থেকে অনেক আলোচনা সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া হয়তো যায়, কিন্তু সেরকম ভাবে সৃষ্টিশীল হওয়া যায় না। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে। বাংলাদেশে বসে তিনি যা লিখেছিলেন, বা লিখতে শুরু করেছিলেন, তার কারণেই তাঁকে দেশত্যাগ করতে হলো। দেশের বাইরে গিয়ে অনেক দেশের উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সম্মান, সুযোগ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাবার পরেও তসলিমা নাসরিন কিন্তু খুব একটা সৃষ্টিশীল হতে পারেন নি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় বাধা বিপত্তি এবং দুঃসময়ও সৃষ্টিশীলতার একটি বড় নিয়ামক।

মুক্তমনার আর্কাইভ থেকে তসলিমা নাসরিনের *দ্বিখন্ডিত* পড়লাম আবার। মুক্তমনার আর্কাইভে বইটির কিছু সমালোচনাও রাখা আছে। *দ্বিখন্ডিত* প্রথমবার পড়েছিলাম ২০০৪ এর নভেম্বরে। *দ্বিখন্ডিত* পড়ার আগেই পড়েছিলাম এ বই সম্পর্কে লেখা সমালোচনাগুলোর কিছু কিছু। বইটার বিরুদ্ধে সৈয়দ শামসুল হক মামলা না করলে বইটা এতটা সমালোচিত হতো না।

দ্বিখন্ডিত সম্পর্কে অনেকেই লিখে জানিয়েছেন তাঁদের মতামত। ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবরের জনকণ্ঠে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন '*জীবনী আত্মজীবনী ও গোপনীয়তা*'। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী মনে করছেন, '*তসলিমা অন্যের দ্বারা তাঁদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছেন। ও তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনায় নিজের ও অনেকের গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়ে সুরুচি বা সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি*'।

২০০৩ সালের নভেম্বরের ২০, ২১ ও ২২ তারিখে জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে মাসুদা ভাট্টির লেখা সমালোচনা, "*তসলিমা নাসরিনের 'ক' ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনাঘন আত্মযৌবনিক কামশাস্ত্র*"। দীর্ঘ এই সমালোচনায় তসলিমার রচনার চেয়েও বেশি সমালোচিত হয়েছে তসলিমার ব্যক্তিগত জীবন। অবশ্য তসলিমার আলোচ্য বইটা তো তাঁর ব্যক্তিগত কথাই। বইটার সমালোচনা করলে ব্যক্তি তসলিমা এসেই পড়েন। তবে মাসুদা ভাট্টির লেখাটা অনেক সময় খুব আক্রমণাত্মক হয়ে পড়েছে। তিনি লিখেছেন, '*এখন প্রতিবছর তাঁর দুটি একটি বই বেরুচ্ছে, হৈ চৈ ফেলে দিচ্ছে শুধুমাত্র যৌনতার কারণেই, কিন্তু যখন তাঁর শরীরে ও কলমে যৌনতার ডেফিসিট হবে, তখন? নিজেকে পরিত্যক্ত ল্যাম্পপোস্ট তসলিমা কেন বানাতে গেলেন বুঝি না। তাঁর 'ক' তাঁকে এরকমই একটি ল্যাম্পপোস্ট বানিয়েছে যেখানে আর কোনদিন হয়ত বাতি জ্বলবে না। কিন্তু পরিত্যক্ত ল্যাম্পপোস্ট পেলে সারমেয়রা যা করে সেটা ভেবে কষ্ট লাগছে।*" সুরুচির পরিচয় মাসুদা ভাট্টিও দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়না।

১৯ ডিসেম্বর যায় যায় দিনে প্রকাশিত হয়েছে সেজান মাহমুদের লেখা "*কঃ অর্ধেক ভর্তি অর্ধেক খালি*"। সেজান মাহমুদ তাঁর লেখায় সমালোচনার সমালোচনাও করেছেন। মাসুদা ভাট্টির লেখার সমালোচনা করেছেন তিনি। আর বর্ণনা করেছেন তসলিমা নাসরিনের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা। সমালোচনা করেছেন তসলিমা প্রসঙ্গে বলা সমরেশ মজুমদারের কথার। লেখকের স্বাধীনতা বিষয়েও

কথা বলেছেন তিনি। তসলিমার 'দ্বিখন্ডিত'র ব্যাপারে তিনি সতর্ক মন্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন অর্ধেক ভর্তি। তাতে বাকী অর্ধেক যে খালি সেই সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

মার্চ ১২, ২০০৪ তারিখে প্রথম আলোর সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে গোলাম মুরশিদের লেখা ''তসলিমার ভালোমন্দ''। তিনি চেষ্টা করেছেন নির্মোহ ভঙ্গিতে দেখাতে যে তসলিমার কোন্ বিষয়টাকে তিনি সাপোর্ট করেন, আর কোন্ বিষয়টাকে সাপোর্ট করতে পারেন না। ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ করাটা উচিত অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু ধর্ষণের বর্ণনা যদি হয়ে ওঠে যৌনসাহিত্য, তাহলে তাতে মূল বক্তব্য চাপা পড়ে।

দ্বিখন্ডিতের কথায় আসা যাক। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খোলামেলা কথা বলেছেন তসলিমা নাসরিন। তাঁর সাহস আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি সবসময় একই রকম নীতি অনুসরণ করতে পারেন না। তাহলে কি তিনি তাঁর নীতি সম্পর্কে ভালো করে না বুঝেই একটা স্টান্ট বজার রেখে চলেন? স্ববিরোধীতা মানুষের মাঝে তখনই আসে, যখন মানুষ নিজেই দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন।

পুরো বই নিয়ে আরো অনেক আলোচনা সমালোচনা হবে। যদি তসলিমা নোবেল পুরষ্কার পেয়ে যান কোনদিন তাহলে তসলিমার সাহিত্য নিয়ে অনেকে গবেষণা করবেন। তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আমি শুধু আমার কেমন লাগলো তা লিখে রাখছি এখানে।

ব্যক্তিগতভাবে তসলিমার সাহসকে আমি শ্রদ্ধা করি। খুব শ্রদ্ধা করি আর ভালোবাসি তাঁর অসাম্প্রদায়িক যৌক্তিক মনকে। তাঁকে অনেক বড় মনে করি বলেই তাঁর সামান্য অসঙ্গতিও খুব বড় করে বাজে আমার। আত্মজীবনী তিনি যেভাবে খুশি সেভাবে লিখতে পারেন। তাতে আমাদের কারো কিছু বলার নেই। কিন্তু যখন তিনি কিছু বিখ্যাত জীবিত মানুষ নিয়ে লেখেন আর সেসব মানুষেরা প্রতিবাদ করেন তাঁর লেখার, বলেন অসত্য লিখেছেন তসলিমা, তখন আমার খুব অসুবিধা হয়। আমার সাথে সাথে আরো অনেকেরও হয়তো মনে হয়, কার কথা ঠিক? সৈয়দ হক ঠিক কথা বলছেন, নাকি তসলিমা? বিখ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্রে কালিমা লেপতে এক ধরণের বিকৃত আনন্দ হয়, তাই হয়তো তসলিমাকেই বিশ্বাস করি। কিন্তু তাতে তো কোনকিছু প্রমাণিত হয়না। আরো একটা ব্যাপার আছে, তা হলো বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন আমরা অনুসরণ করতে চাই, আমরা মানে যারা সাধারণ মানুষ। ছোট ছোট মেয়েরা যারা এখনো জীবন শুরু করেনি, তসলিমাকে যারা মনে করতে পারে আদর্শ, তাদের সামনে তসলিমা কেন নিজেকে বিতর্কিত করে তুলবেন?

দ্বিখন্ডিত বইতে অনেক ভালো ভালো কথাও আছে। ডাক্তারী পাশ করার পরে নিজের পেশাগত সংগ্রাম, সহকর্মীদের অসহযোগিতা, ঢাকায় মেয়ে বলে বাসাভাড়া পাবার ঝামেলা, বাবার অত্যাচার, প্রেমিকদের অত্যাচার, স্বামীদের অত্যাচার কিছুই বাদ যায়নি। তসলিমাকে অনেক সংগ্রাম করে নিজের আসন অর্জন করতে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিজেই কিছু বিতর্কিত কাজ করেছেন বা লিখে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। যেগুলো কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য হলে কিছু বলার থাকতো না, কিন্তু সে ঘটনাগুলোর পেছনে তসলিমার কোন আদর্শ কাজ করেনি। যেমন সৈয়দ শামসুল হকের ব্যাপারটা।

সৈয়দ শামসুল হকের সৃষ্ট চরিত্র বাবর আলির সাথে সৈয়দ হকের তুলনাটা তসলিমার কাছে আশা করিনি। রাঙামাটি বা কাপ্তাই যাওয়ার অনেক আগে থেকেই সৈয়দ হকের সাথে তাঁর সম্পর্ক, যেটা অনেকটা পারিবারিক না হলেও ব্যক্তিগত। শুধুমাত্র একজন কবির সাথে অন্য একজন কবির সম্পর্ক ছিলো না

সেটা। তসলিমা নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছেন সৈয়দ হকের কাছ থেকে। একজন মানুষকে পুরোটা না জেনে তাকে ভালো বলা যায়, কিন্তু কোন মানুষকে খারাপ বা উদ্দেশ্যপরায়ন বলতে হলে তো প্রমাণ লাগে। দোষী প্রমাণিত হবার আগে যেমন কাউকে অপরাধী বলা যায় না সেরকম। সৈয়দ হক তসলিমার সাথে কোন ধরণের জোর জবরদস্তি করেছেন বা অপমানজনক কিছু করেছেন বলে আমরা প্রমাণ পাইনা। তসলিমা যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও প্রমাণিত হয়না যে সৈয়দ শামসুল হক কোনরকম জোর খাটিয়েছেন তসলিমার ওপর। তারপরও ধরে নিলাম তাঁর খুব খারাপ উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু এতে তসলিমা নিজেও কি উৎসাহ দেননি?

হুমায়ূন আজাদ যে প্রচন্ডরকম আত্মম্ভরী মানুষ তা প্রায় সবাই জানেন। তসলিমা সম্পর্কে তিনি হয়তো বাজে কথা বলেছেন। কিন্তু তিনিই তসলিমাকে উৎসাহ দিয়েছেন লেখা চালিয়ে যেতে। হুমায়ূন আজাদ যে নিজের লেখার প্রশংসা করে নিজেই পত্রিকায় বেনামে চিঠি লিখেছেন তা কীভাবে জানলেন তসলিমা? পত্রিকার অফিস থেকে? তসলিমার লেখা যেভাবে যখন যেখানে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম থেকে, তসলিমার লেখা থেকেই দেখা যাচ্ছে সব সম্পাদক বা সংশ্লিষ্টদের সাথে তসলিমার ব্যক্তিগত একটা সম্পর্ক ছিলো। এটা হয়তো খুব স্বাভাবিক। লেখকদের সাথে সম্পাদকদের সম্পর্ক তো থাকবেই। কিন্তু সমস্যা হলো যখন নিজের সম্পর্ক থাকাটাকে তসলিমা স্বাভাবিক ভাবেন অথচ অন্যকোন লেখকের একই রকম সম্পর্ককে তিনি উদ্দেশ্যমূলক মনে করেন।

হুমায়ূন আজাদ যখন *"নারী"* লেখেন ভীষণ খেটেখুটে লিখেছেন। তসলিমা এটা নিয়ে মন্তব্য করেছেন *"যে কথা আমি অনেক আগেই বলেছি, সে কথাগুলোই তিনি লিখেছেন নতুন করে, তিনি বহু বই ঘেঁটে উদাহরণ দিচ্ছেন, আমি কোনও বই না ঘেঁটে মনে যা ছিল তাই লিখেছি, এই যা তফাৎ।"* তসলিমা কেন এরকম করে নিজেকে ছোট করেন আমি জানিনা। নারীর ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যগুলো তসলিমা নিজের মন থেকে লিখেছেন? তথ্যের জন্য সুকুমারী ভট্টাচার্যের বই থেকে হুবহু টুকতে হয়েছে তসলিমাকে। তসলিমা তাঁর লেখায় সুকুমারী ভট্টাচার্যের বইটার উল্লেখও করেননি। আনন্দ পুরষ্কার পাবার পরে এ নিয়ে সমালোচনা হবার পরে তিনি স্বীকার করলেন যে এটা করা হয়েছে, কিন্তু তেমন অন্যায় হয়নি। গবেষণাতো একা করা যায় না কোন সময়েই। গবেষণা সব সময়েই একটা সমন্বিত প্রচেষ্টা। তসলিমা কেন এ নিয়ে অহেতুক কথা বলেন।

নিজের পেশার এফসিপিএস বা উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া মানুষের প্রতিও তসলিমা অহেতুক বাজে কথা বলেছেন। তিনি নিজে উচ্চতর ডিগ্রি নেননি বলে আর যারা নিয়েছেন তাঁরা তো কোন অন্যায় করে ফেলেননি।

ইমদাদুল হক মিলনকে নিয়ে তিনি কাশ্মির চলে গেলেন। মিলন বিবাহিত, মিলন সংসারী। মিলনকে তিনি ভালোবাসেন না। তারপরও তিনি মিলনকে সিডিউস করেছেন। কাজটা কি তিনি ভালো করেছেন? তিনি নিজেকে যৌন-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলেন। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিনা। আমি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। তসলিমাও করেন। একজন মানুষ যদি স্বাধীন হন, তাহলে আলাদা করে যৌন-স্বাধীনতা কথাটার মানে কী? যৌন-স্বাধীনতা মানে কি যখন তখন যার সাথে খুশি শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা? স্বাধীনতা কথাটার মানে যদি স্বেচ্ছাচারিতা হয় তাহলে তসলিমা নাসরিন আসলে কোন্ ধরণের সমাজ ব্যবস্থার কথা ভাবেন আমি জানিনা। পশুদের জীবন তো মানুষের কাম্য হতে পারে না। রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নাঈম, মিনার মাহমুদ, হেলাল হাফিজের সাথে তসলিমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। সেটা তসলিমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ এ সম্পর্কগুলো শুধুই ব্যক্তিগত সম্পর্ক। কোন

ধরনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কারণে এ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। কিন্তু একটা কথা তো তসলিমা মানবেন যে, তসলিমা যে ফিল্‌ডে কাজ করছেন, সামাজিক পর্যায়ে, সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে কোন ধরণের পরিবর্তনই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে যেটা সম্ভব সামাজিক কাজে তা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে কাজের গুরুত্ব বেশি। আইনস্টাইনকে আগে আইনস্টাইন হতে হয়েছে তাঁর আবিষ্কার দিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব বেশি মাথাব্যথা নেই তেমন কারো। ফাইনম্যান টপলেস রেস্টুরেন্টে বসে পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যার সমাধান করেন। তাতে কারো কিছু যায় আসেনা। কিন্তু প্রফেসর ইউনুস বা অমর্ত্য সেন যদি টপলেস বারে যান, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা কোথায় যাবে তা তসলিমা বোঝেন নিশ্চয়।

বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ কি আসলে কিছুই করছে না মেয়েদের জন্য? সুফিয়া কামাল জড়িত ছিলেন এর সঙ্গে। এখন যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা কি সবাই স্বার্থপর? শুধুমাত্র নামের জন্যই করেন? তসলিমা নাসরিন মালেকা বেগমকে একহাত নিয়েছেন, সাথে মহিলা পরিষদেরও। কারণ মহিলা পরিষদ তসলিমার পক্ষে আন্দোলন করেনি। করলে কি তসলিমার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম হয়ে যেতো? তসলিমা নাসরিনের আনন্দ পুরস্কার পাওয়াতে অনেকের ঈর্ষা হতেই পারে। তা নিয়ে তসলিমার কথা বলার দরকার আছে? তসলিমা তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি পাবার পরেও কেন অন্যের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন? তসলিমা অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, আরো পাবেন, নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা পেতে হলে তো মানুষের কাছে যেতে হয়, মানুষকে বুঝতে হয়। যারা আসলেই বড় তারা তো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রচার করেন না।

তসলিমা নাসরিনের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। তাঁকে অনেক বড় মাপের মানুষ ভাবতে চাই বলেই আশা করি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রচার করে তিনি সময় নষ্ট করবেন না।

---

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া